জোড়াসাঁকো, ১৪ কার্তিক, ১২৯৯

যেতে নাহি দিব

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি ; বেলা দ্বিপ্রহর ;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
মধ্যাহ্ন-বাতাসে ; স্নিগ্ধ অশত্থের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি
ঘুমায়ে পড়েছে ; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম--
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।

গিয়েছে আশ্বিন-- পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূরদেশে
সেই কর্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিসপত্র দড়াদড়ি লয়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ-ঘরে ও-ঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার
একদণ্ড তরে ; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে ; যথেষ্ট না হয় মনে

যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, ‘এ কী কাণ্ড!
এত ঘট এত পট হাঁড়ি সরা ভাণ্ড
বোতল বিছানা বাক্স রাজ্যের বোঝাই
কী করিব লয়ে কিছু এর রেখে যাই
কিছু লই সাথে।’

সে কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোনো জন। ‘কী জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে ?
সোনামুগ সরু চাল সুপারি ও পান ;
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি ; কিছু ঝুনা নারিকেল ;
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল ;
আমসত্ত্ব আমচুর ; সের দুই দুধ--
এই-সব শিশি কৌটা ওষুধবিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,
মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে।’
বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাক্যব্যয়।
বোঝাই হইল উঁচু পর্বতের ন্যায়।
তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে ; কহিলাম ধীরে,
‘তবে আসি’। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষু-’পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।

বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের। এতক্ষণ
অন্য দিনে হয়ে যেত স্নান সমাপন,
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে ; আজি তার মাতা

দেখে নাই তারে ; এত বেলা হয়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁষে,
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্তদেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কী জানি কী ভেবে
চুপিচাপি বসে ছিল। কহিনু যখন
'মা গো, আসি' সে কহিল বিষণ্ন-নয়ন
ম্লান মুখে, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল--'যেতে আমি দিব না তোমায়'।
তবুও সময় হল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল।

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হতে কী শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা, এত স্পর্ধাভরে--
'যেতে আমি দিব না তোমায়' ? চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোটো হাতে
গরবিনী, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ।
ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে, শুধু বলে রাখা 'যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি'। হেন কথা কে পারে বলিতে
'যেতে নাহি দিব'! শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ববাণী, সকৌতুকে

হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে,
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভ'রে
দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন,
আমি দেখে চলে এনু মুছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগ-যুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।' সবে
কহে 'যেতে নাহি দিব'। তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে 'যেতে নাহি দিব'।
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব,
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শত বার 'যেতে দিব না রে'।
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন--'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে।

প্রলয়সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত-ব্যগ্র-বাহু জ্বলন্ত-আঁখিতে
‘দিব না দিব না যেতে’ ডাকিতে ডাকিতে
হু হু করে তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
সম্মুখ-ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
‘দিব না দিব না যেতে’-- নাহি শুনে কেউ
নাহি কোনো সাড়া।

চারি দিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্ব-মর্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে ; শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু তো রে
শিথিল হল না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মতো
অক্ষুণ্ন প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডাকি
‘যেতে নাহি দিব’। ম্লান মুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়
‘যেতে নাহি দিব’। যত বার পরাজয়

তত বার কহে, 'আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।
আমার আকাঙ্ক্ষা-সম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল বিশ্বে কিছু আছে আর!'
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার
'যেতে নাহি দিব'। তখনি দেখিতে পায়,
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলি-সম উড়ে চলে যায়
একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন ;
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরু-সম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব নতশির। তবু প্রেম বলে,
'সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার-লিপি।'-- তাই স্ফীত বুকে
সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে, 'মৃত্যু তুমি নাই।-- হেন গর্বকথা!
মৃত্যু হাসে বসি। মরণপীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ন নয়ন-'পরে
অশ্রুবাষ্প-সম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চির-কম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ-কুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে--
দুখানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে,
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া--
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া।

তাই আজি শুনিতেছি তরুরক মর্মরে
এত ব্যাকুলতা ; অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে ; বেলা ধীরে যায় চলে

ছায়া দীর্ঘতর করি অশত্থের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে ; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো।